মামুনুর রশীদের 'রাষ্ট্র বনাম': নিরীহ নিপীড়িত মানুষের দাহ ও দ্রোহের শিল্পভাষ্য

শামীম হাসান*

সারসংক্ষেপ: সমাজজীবনে যখন অন্যায়-অবিচার ও অশুভ শক্তি বড় হয়ে ওঠে, তখন তা স্পর্শকাতর সৃজনক্ষম শিল্পচিত্তে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর ফলে জন্ম নেয় উদ্দেশ্যবাদী শিল্পকর্ম। বাংলা নাট্যশিল্পে এমন শিল্পকর্মের স্রষ্টা স্বাধীনতাত্তর বাংলাদেশের মঞ্চ আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ নাট্যকার মামুনুর রশীদ। মামুনুর রশীদ রচিত 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকে নিরাপরাধ নিরীহ মানুষের ওপর রাষ্ট্র, বিচারব্যবস্থা ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর নির্দয় মনোভঙ্গি ও অন্যায়-বিচারের অমানবিক ঘটনাবলি সুনিপুণ শৈল্পিক বাস্তবতায় চিত্রিত হয়েছে। দুর্বৃত্তের চিরায়ত চরিত্র, শক্তিহীন নিরীহ মানুষের ওপর অন্যায়-অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর প্রভৃতি বিষয়বস্তু 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের অন্যতম মূলচিন্তা বা মর্মসার। নাটক পাঠ ও প্রযোজনাতে উক্ত চিন্তাসমূহ দর্শক-পাঠকের হৃদয়বৃত্তি ও ভাবনায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। শিল্পের আনন্দ আয়োজনের পাশাপাশি 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের মূল চিন্তা সামাজিক উপযোগিতাকে উপলক্ষ করেই আবর্তিত, যা শিল্পের শিল্প হয়ে ওঠা এবং শিল্পের সামাজিক উদ্দেশ্যের এক নান্দনিক মেলবন্ধন। 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকে নিগৃহীত সাধারণ মানুষের আপাত পরাজয় এবং সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কিছু মানুষের নিপীড়নের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ ঘটনা। এতে ভীত-সন্ত্রস্ত নিরাপরাধ মানুষের দণ্ডভোগ ও শোষকের নিষ্পেষণের বিপরীতে অধিকার বঞ্চিত মানুষের সুখ-স্বপ্ন, মানবিকতা ও প্রতিরোধ-চেতনা বিশ্লেষণের অভিপ্রায়ে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মূল প্রসঙ্গ অবতারণার পূর্বে মামুনুর রশীদের ভাবনাজাত নাট্যশিল্পকলার বৈশিষ্ট্য উন্মোচন অত্যন্ত জরুরি। কেননা "একটি নাটক বিচার করতে হলে প্রথমেই জানতে হয় তার নাট্যকারকে? তিনি কোন যুগে কোন ধরনের নাট্যশালার সঙ্গে কিভাবে যুক্ত ছিলেন। সে যুগের রঙ্গালয় বিধিব্যবস্থা কেমন ছিল প্রভৃতি" (দুর্গাশংকর, ২০০৩:৪৩)। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় মামুনুর রশীদের সম্পৃক্ততার কিছু পটভূমি উপস্থাপনের মাধ্যমে তাঁর নাট্যদর্শন ও শৈল্পিক চেতনার প্রকৃত স্বরূপ অন্বেষণের চেষ্টা করা যেতে পারে।

* সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

একথা আজ প্রমাণিত সত্য যে বাংলাদেশের নাটকের বিকাশে মহান মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। "মুক্তিযুদ্ধ যেমন সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্তি দিয়েছিল তেমনি অনুপ্রাণিত করেছিল মঞ্চনাটকের মতো একটি শিল্পমাধ্যমকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করতে" (অলোক, ২০১৯:১০৩)। স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশের শিল্পসংস্কৃতির নানা ধারার মধ্যে যে শাখাটি মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত আদর্শ ও চেতনাকে ধারণ করে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান সুসংহত করতে সক্ষম হয়েছে, তা হলো আমাদের মঞ্চনাটক। এ প্রসঙ্গে মামুনুর রশীদ তাঁর 'অসংকোচ-প্রকাশের দুরন্ত সাহস' নিবন্ধে উল্লেখ করেন–

> মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু যুবক-যোদ্ধা রাইফেলটা ফেলেই নাট্যশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের সেই তরতাজা কমিটমেন্ট, কিছু একটা নিঃস্বার্থভাবে করা। স্বাধীনভাবে কিছু ভাবা ভুল-শুদ্ধ কিছু একটা আন্তরিকভাবে করে যাওয়া-এসবই ঘটল এ শিল্পে (মামুনুর, ২০০৫:৬৮)।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে বিকশিত শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার ফলস্বরূপ ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে পদচারণা শুরু হয় 'আরণ্যক'[১] নাট্যদলের। শুরুতেই আরণ্যক মঞ্চস্থ করে মুনীর চৌধুরীর বিখ্যাত নাটক 'কবর'। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত 'কবর' নাটকের নির্দেশনা নিঃসন্দেহে মামুনুর রশীদের দেশাত্মবোধ ও প্রতিবাদী চেতনার নিদর্শন। পাশাপাশি 'কবর' নাটক প্রযোজনার মাধ্যমে "আরণ্যকের ভবিষ্যৎ চিত্রটিও যেন ফুটে ওঠে" (আশিস, ২০০১: ৩২)। এছাড়াও মামুনুর রশীদের কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন থেকে স্বল্প কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে তাঁর শিল্পচেতনার প্রকৃতি ও প্রবণতাসমূহ উপলব্ধি করা আরও সহজ হবে। "সামরিক শাসনামলে যখন কোনো রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক দল সাহস পায়নি 'মে দিবস' এর তাৎপর্য তুলে ধরতে, তখন 'আরণ্যক' একা মে দিবস পালন করেছে" (আশিস, ২০০১:১৯)। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 'আরণ্যক'-এর মহড়াকক্ষ হয়ে উঠেছে শ্রেণিসংগ্রাম, সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহ-বিপ্লবের সূতিকাগার। তাই "কার্ল মার্কস-এর মৃত্যু শতবর্ষে আরণ্যক 'নাটক শুধু বিনোদন নয় শ্রেণী সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার" (আশিস, ২০০১:৩৪) স্লোগানকে সঙ্গী করে তাদের স্বতন্ত্র নাট্য আন্দোলন শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় মামুনুর রশীদের নেতৃত্বে আশির দশকে রাজনৈতিক থিয়েটারের ভাবনাজাত 'মুক্ত নাটক', 'পথ নাটক' চর্চা শুরু করে তারা। থিয়েটারকে শুধু মঞ্চে বা মিলনায়তনে আবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর জনগণের সামনে উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে আরণ্যক। তবে "আরণ্যক নাট্যদলে শুধু সাফল্য নয়, পারা না পারার ব্যর্থতাও

আছে, তবে থেমে থাকা নেই, এগিয়ে যাবার ইচ্ছেটাই সম্বল" (আশিস,২০০১:২১)। এ প্রসঙ্গে 'আরণ্যক একটি দলের নাট্যকথা' গ্রন্থের গবেষক ও সম্পাদক ড. আশিস গোস্বামী বলেন– "আরণ্যকের অনেক প্রযোজনা কমজোরি, ভালো লাগেনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তবুও শেষ পর্যন্ত আরণ্যকের প্রতি একটা টান অনুভব না করে পারিনা তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য"। আসলেই আরণ্যক বিশ্বাস করে না যে "রাজনীতি বিচ্ছিন্ন শ্রেণী উর্ধ্ব বা শ্রেণী নিরপেক্ষ কোনো শিল্পকলা আছে" (আশিস, ২০০১:৪৩)। তাই মামুনুর রশীদ সর্বদাই তাঁর সাংস্কৃতিক সহযাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে এদেশের নানা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ে রাজপথে থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। কেননা সংস্কৃতি, রাজনীতি কিংবা বাংলাদেশের মঞ্চ আন্দোলনের দীর্ঘ যাত্রায় আপোষহীন ও নির্ভীক নাট্যশিল্পী মামুনুর রশীদ। থিয়েটারের প্রতি মামুনুর রশীদের কমিটমেন্ট সম্পর্কে প্রখ্যাত নাট্যনির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুর মূল্যায়ন উল্লেখযোগ্য-

> "মামুন ভাইকে আমি বলি নিঃসঙ্গ পথিক, কুরু থেকে যে আদর্শ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, এখনো সেই আদর্শে অবিচল আছেন। তিনি কখনো আপোষ করেননি। স্বৈরশাসক এরশাদের দেওয়া বাংলা একাডেমি পুরষ্কার তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন" (বাচ্চু, ২০১৬:৭)।

সত্যিকার অর্থেই নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা কিংবা সংগঠক যে উপাধিতেই তাঁকে ভূষিত করা হোক না কেন, সেখানেই তিনি প্রজ্ঞাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ নাট্যশিল্পী। একজন মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একনিষ্ঠ কর্মী মামুনুর রশীদের নাট্য-চেতনার ভুবন গড়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধ, শ্রেণিসংগ্রাম, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার অধিকার, দেশাত্মবোধ ও আবহমান বাংলা জনপদের বৈচিত্র্যময় সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্পর্শে।

মামুনুর রশীদের শুরুর দিকের নাটক থেকে এই সময়ের 'রাঢ়াং', 'বঙ্গভঙ্গ' কিংবা 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকগুলোর বিষয়বস্তুতে উক্ত বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ মেলে। তিনি নাটককে কেবল বিনোদনের গতানুগতিক মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা না করে নাটকের মাধ্যমে মানুষকে আত্মসচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভোগবাদী সমাজের সুবিধাবাদিতা, স্বৈরাচারের উত্থান, ধর্মীয় মৌলবাদ, রাষ্ট্রে দেশদ্রোহীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মামুনুর রশীদ প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়েছেন। অধিকারবঞ্চিত মেহনতি মানুষের ওপর চলমান অত্যাচার, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা মামুনুর রশীদের নাট্যচর্চার অন্যতম আরাধ্য। নাটক রচনা ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রতিরোধ-চেতনার সঙ্গে মামুনুর

রশীদের জীবন-ঘনিষ্ঠতা বা সামাজিক বাস্তবতার বিষয়টি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁর প্রতিবাদী চেতনা প্রধানত সমকালীন সমাজজীবনের অবক্ষয় ও অন্যায়-অবিচারের প্রেক্ষাপটে উদ্ভাসিত।

মামুনুর রশীদ অত্যাচারিত মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের শিল্পভাষ্য নির্মাণে প্রয়াসী। সেই প্রেক্ষাপটে রচিত সমাজজীবনাশ্রিত সমসাময়িক রাজনৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে রচিত শিল্পসফল নাটকের অন্যতম উদাহরণ হতে পারে তাঁর 'রাষ্ট্র বনাম'। তবে তাঁর অসাধারণ সব নাট্যকৃতির পাশে 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকটি খানিকটা কম আলোচিত। মামুনুর রশীদ রচিত অনেক নাটক বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সাফল্যের সঙ্গে নিয়মিতভাবে অভিনীত হচ্ছে। সে তুলনায় 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের মঞ্চরূপায়ণ কিংবা নিয়মিত প্রদর্শনীর সংবাদ খুব একটা শোনা যায় না। কিন্তু জীবনবোধ, কল্পনাশক্তি, সত্য-উন্মোচন এবং আলো-আধাঁরের চিত্রকল্প নির্মাণে 'রাষ্ট্র বনাম'-এর তাৎপর্য ব্যাপক ও গভীর। মূল্যবোধের অবক্ষয়-আশ্রিত 'রাষ্ট্র বনাম'-এর নাটলিপি দর্শক ও পাঠকের মনোজগতে এক ভিন্ন সুরের আলোড়ন তোলে, যে সুরের অর্ন্তনিহিত আহ্বান হলো মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা-মমত্ববোধ এবং অবিচারের বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়ানোর সংশয়হীন প্রত্যয়। 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের ঘটনা-পরম্পরা যেন বৈপরীত্যের সাহায্যে সত্যের উদ্ভাসন।

সম্প্রতি চট্টগ্রামের মঞ্চে মামুনুর রশীদ-রচিত 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকটি মঞ্চায়িত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের চতুর্থ বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির অভিনয় শিক্ষণ ও প্রয়োগ-প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। উক্ত নাট্যনির্মাণ প্রক্রিয়ার পাণ্ডুলিপি নির্বাচন এবং মহড়ার প্রাথমিক প্রস্তুতিতে বর্তমান প্রবন্ধকারের সম্পৃক্ততার বিষয়টি স্বীকার করে প্রবন্ধের মূল প্রসঙ্গে প্রবেশের প্রাথমিক সূত্র হিসেবে প্রযোজনা নির্মাণে 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকটি নির্বাচনের পেছনের কারণসমূহ তুলে ধরা প্রয়োজন। কোর্স শিক্ষক হিসেবে প্রবন্ধকারের ওপর দায়িত্ব বর্তায় অভিনয়-উপযোগী একটি পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের। শর্ত হলো বাংলাদেশের গুণী নাট্যকারদের তুলনামূলক স্বল্প মঞ্চায়িত নাটক, যার বিষয়বস্তু এই সময়ের দর্শকদের যুক্ত করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি নাটকের ব্যাপ্তি এমন হবে, যাতে একটি বর্ষের সকল শিক্ষার্থী অভিনয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এসব একাডেমিক শর্তাবলি স্বীকার করে অনুসন্ধান শুরু হয়। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নাট্যকারদের অনেক পাণ্ডুলিপি পাঠ শেষে নাট্যকার মামুনুর রশীদের 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকটি উপরোক্ত শর্তাবলির পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ বলে বিবেচিত হয়। তাই প্রযোজনার জন্য মামুনুর রশীদের 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকটি বাছাই করা হয়। বিভাগের প্রভাষক

ও তরুণ নির্দেশক মোঃ তানবির হাসানের ওপর নাটকটি নির্দেশনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পাণ্ডুলিপি পাঠের মধ্য দিয়ে যাত্রারম্ভ হয় নাট্য নির্মাণ প্রক্রিয়ার। 'রাষ্ট্র বনাম' নাট্য প্রযোজনার প্রাথমিক প্রস্তুতিতে এটুকুই বর্তমান প্রবন্ধকারের সংশ্লিষ্টতা। এরপর প্রযোজনাটি প্রত্যক্ষণ ও পাণ্ডুলিপি পাঠের ওই পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে অর্জিত ভাবনা বিনিময়ের লক্ষ্যে এই প্রবন্ধ রচনার উদ্যোগ। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রস্তাবিত প্রতিপাদ্য বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন এবং এতে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তর নির্ণয়ে 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের পাণ্ডুলিপি ও মঞ্চরূপায়ণ বিশ্লেষণের প্রয়াস পাব।

নাটকের অন্যতম প্রধান ঘটনাস্থল সোমজানি গ্রামের দৃশ্য বর্ণনার লক্ষ্যে নাট্যকার-বর্ণিত 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের প্রথম দৃশ্যের প্রথম লাইন 'সোমজানি গ্রামের শুকিয়ে যাওয়া নদী' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা একটি নাটকের একেবারে শুরুতে এরকম একটি লাইন ব্যবহারের মাধ্যমে নাটকটির ধরন এবং মূলভাব ('root-idea' বা 'ভাববীজ'[২]) সম্পর্কে খানিকটা ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। তবে শুকিয়ে যাওয়া নদীর পাড়ের খেয়াঘাটে একতারার সুরের মধ্য দিয়েই সূচনা হয় 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের। শুকিয়ে যাওয়া নদী বনাম একতারার সুর প্রারম্ভিক নাট্যদৃশ্যের এই বিমূর্ত বৈপরীত্যই যেন 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের আসল নির্যাস, যেখানে পক্ষ-বিপক্ষ, বৈষম্য-বিভাজন নিরুপিত হয়েছে বাস্তবিক শিল্পভাষ্যে। অসম দুটি শ্রেণিকে পাশাপাশি অবস্থানে উপস্থাপন করে নাট্যকার বিরুদ্ধতা ও বৈষম্যের রুগ্ন রূপ অঙ্কন করতে চেয়েছেন। নাটকের শুরুতেই সুন্দর ও অসুন্দরের এই সহাবস্থান নাট্যঘটনা পরম্পরায় নানা বাঁক অতিক্রম করে পরিণতিতে এক শিল্পসৌন্দর্যে উন্নীত হয়। পাণ্ডুলিপি ও প্রযোজনা বিশ্লেষণের বিভিন্ন ধাপে উক্ত প্রসঙ্গের ওপর আলোকপাত করা হবে।

যে সুর ও সংলাপগুচ্ছ দিয়ে নাটকটি শুরু, সেগুলো বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের নীলফামারীর আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত নীলফামারীর স্থানীয় মানুষের মুখের ভাষাকে নাট্যভাষায় রূপান্তরের এই নান্দনিক প্রচেষ্টা শুরুতেই একজন পাঠককে নাটকটি পাঠে আকৃষ্ট করে। আঞ্চলিক ভাষার স্বকীয় সৌন্দর্য, বৈচিত্র্যময়তা ও এক অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের ভাষার সূক্ষ্ম ভিন্নতাকে যথাযথ ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারার দক্ষতা এখানে অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের প্রথম দৃশ্যের সংলাপ লক্ষ করলে আঞ্চলিক ভাষার কৌতূহলোদ্দীপক সম্মোহন শক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়:

> জুলমত: মজমা, তুই এইঠে, এইঠে এইসে আবার মজমা জমাইছিস ও পাক সরষে ক্ষেত্রে গরু ঢুকছে তোক পাঠানু কি করতে।

> গ্রামবাসী: (একজন) আচ্ছা বাহে চেংড়াটাকে মারিছেন কেন? (মামুনুর, ২০১৩:১৩০)।

আঞ্চলিক ভাষার এই সহজাত সুর ও ছন্দের যথার্থ উপস্থাপন নাটকটির প্রতি পাঠক ও দর্শকের আগ্রহের অন্যতম কারণ। এ কথা স্বীকার করতে হবে যে প্রযোজনা নির্মাণে 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকটি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষার এমন সুন্দর সাবলীল ও অর্থপূর্ণ প্রয়োগশৈলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের ঘটনাপরম্পরা গড়ে উঠেছে সোমজানি গ্রামে সংঘটিত একটি হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে। সারাদিনের কর্মক্লান্তি শেষে সন্ধ্যার পর সোমজানি গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা খেয়াঘাটের পাশে একটি ছোট দোকানে হারিকেনের আলোয় গানের আসর বসিয়েছে। আসর বেশ জমে উঠেছে। তেজারত একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। সোমজানি গ্রামের খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের নির্মল এই নিত্য আয়োজন উপভোগ করছে উপস্থিত সবাই। হঠাৎ গুলির শব্দ। এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণকারী ও সাধারণ মানুষের আতঙ্ক বড় পরামানিক গুলি খেয়েছে। সোমজানি গ্রামের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লাঠিয়ালদের কণ্ঠে আহ্বান শোনা যায়,আলো-আঁধারিতে প্রচণ্ড তাণ্ডব গ্রামে, মানুষের চিৎকার, পুলিশের বাঁশি, ভয়ে দিশেহারা মানুষের ছোটাছুটি চলতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। হালকা অন্ধকারের মধ্যে দেখা যায় সেই একতারাবাদক শিল্পী তেজারত, তার দাদা আসমত, বাবা জুলমত ও সোমজানি গ্রামের নিরীহ অধিবাসী সমিরন বেওয়াকে বড় পরামানিকের পুত্র আজিজলের নির্দেশে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়।

বড় পরামানিকের পুত্র দুর্বৃত্ত আজিজলের প্রত্যক্ষ ইশারায় পুলিশের মনগড়া রিপোর্টে শুরু হয় সাজানো বিচার। সাক্ষী হিসেবে আদালতে হাজির করা হয় নিহত বড় পরামানিকের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তৈরি করা ডাক্তারকে। বুলেট ইনজুরিতে নিহত হয়েছেন বড় পরামানিক, কিন্তু তেজারত, আসমত, জুলমতদের মতো নিরীহ খেটে খাওয়া মানুষদের দোষী সাব্যস্ত করতে হলে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে উল্লেখকৃত বুলেট ইনজুরির প্রসঙ্গটি পরিবর্তন করতে হবে। কারণ তেজারতদের মতো গানপাগল বাউলশিল্পী ও সাধারণ মানুষের কাছে একতারা থাকলেও অস্ত্র থাকার কথা নয়। তাই আজিজল ডাক্তারকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পরিবর্তন করার জন্য। কিন্তু পেশাগত নৈতিক দায়িত্বের কথা ভেবে আজিজলের কথায় রাজি হন না ডাক্তার। শেষে ডাক্তারের পিতার বন্ধুর সাহায্যে ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করে ডাক্তারকে দিয়ে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ম্যানিপুলেট করাতে সক্ষম হয় আজিজল। ঘটনার এ পর্যায়ে নির্ভীক

চিত্তে আদালতে সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হন স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে লড়াই করা নারী আজিজল পরামানিকের স্ত্রী। পরামানিক বাড়ির বউ হয়েও পরামানিক খুনের আসল রহস্য উদঘাটনে আজিজলের স্ত্রী আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দ বের হয় না। শুধু শারিরীক অঙ্গভঙ্গি (মাইম)-র সাহায্যে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। অর্থ, ক্ষমতা আর স্বজনপ্রীতির বেড়াজালে জিম্মি সাজানো বিচারব্যবস্থার চূড়ান্ত ফল অনুমানে কষ্ট হয় না অভিজ্ঞ উকিল জলিলের। সে জানে "জাতির এই ছোট্ট ইতিহাসে বহুবার বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে। বিচার হয়নি। রাষ্ট্রের নিরাপদ হেফাজতে থেকেও মৃত্যুবরণ করেছে অনেক কয়েদি। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক দেশদ্রোহী" (মামুনুর, ২০১৩:১৮১)। চূড়ান্ত রায় পাঠ করেন জজ। অন্যায় বিচারের রায়ও শব্দহীনভাবে পড়া হয়। রায় পড়া শেষ না হতেই সমিরন বেওয়া কান্নায় ভেঙে পড়েন। সাজা হয় নিরীহ নিরাপরাধ তেজারত, আসমত, জুলমত ও সমিরন বেওয়াদের।

সাত বছর জেল খেটে আসমত ফকির জেলেই মৃত্যুবরণ করেছে; আজিজল তাকে মারতে পারেনি। জেলখানায় পাখি ডাকে না, সূর্য দেখা যায় না, আকাশ দেখা যায় না। কয়েদিদের কিনে দেয়া একতারা তেজারতকে সব দেখায়। একতারার সুর তাকে বাঁচিয়ে রাখে, স্বপ্ন দেখায়। সে গান গায়-

দোকান খোল দেখি
পসরা সাজাও দেখি
যে ঘাটে রাধিকা হবে পার
কানাই সে ঘাটের মাঝি (মামুনুর, ২০১৩:১৮৩)।

'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের মূল নাট্যক্রিয়া ওপরে বর্ণিত ঘটনাবিন্যাসকে অবলম্বন করে আবর্তিত হয়েছে। তবে নাট্যঘটনার প্রতিটি পরতে পরতে সমসাময়িক জীবনধারায় দুর্বৃত্তের দৌরাত্মে সাধারণ মানুষ যে কতটা নিরুপায়, সেই বাস্তবিক গল্পগাঁথা গভীর পর্যবেক্ষণের দ্বারা অঙ্কন করেছেন মামুনুর রশীদ। সমাজে গুটিকয়েক নষ্ট মানুষের ধর্মান্ধতা, ভোগ-বিলাস ও ক্ষমতার নেশার মতো খারাপ প্রবৃত্তিগুলোকে চরিতার্থ করতেই যে শোষণ নিষ্পেষণের শিকার হয় সমাজের বৃহত্তর অংশ অর্থাৎ সাধারণ জনগণ, সেই চিত্রই অসাধারণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন নাট্যকার মামুনুর রশীদ। পাশাপাশি তিনি মনুষ্যত্ববোধ, জীবনবোধের গভীরতা, মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ব এবং শত প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখার পথের সন্ধান দিতে চেয়েছেন। তার মানে তিনি অসুন্দরের ভেতরেই সুন্দরের উদ্বোধন করেছেন। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে

আজিজল পরামানিকের ঘরে প্রতিবাদী ও মমতাময়ী নারী আজিজলের স্ত্রীর অবস্থান। পুরো নাটকের মূল চিন্তা বিশ্লেষণে শুভ ও অশুভর পরিপূরক স্থিতি আবিষ্কার করা সম্ভব, যেখানে নাট্যকার আজিজলদের মতো অশুভ শক্তিকে দারুণভাবে চিত্রিত করে অর্ন্তনিহিতভাবে শুভ, কল্যাণ ও মানবিক মহানুভবতার জয়গানই গেয়েছেন।

যেহেতু বর্তমান প্রবন্ধকারের পাণ্ডুলিপি নির্বাচন ও পাঠ-পর্যালোচনার সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল, সেহেতু মঞ্চরূপায়ণ উপভোগের অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডুলিপি পাঠকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা বিস্তার লাভ করবে। অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি ও নাট্যপ্রযোজনার নানাবিধ ড্রামাটিক টার্মস (dramatic terms) একই সঙ্গে বিশ্লেষিত হবে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে নাট্যঘটনার যে বাস্তববাদী ডিটেইলের বর্ণনা রয়েছে, নাট্য নির্দেশক হুবহু সেই বর্ণনা অনুসরণ না করে তিনি খানিকটা 'সিলেকটিভ রিয়ালিজমে'র[৩] (Selective Realism) পথে হেঁটেছেন। ন্যূনতম দৃশ্যনির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করে পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখকৃত সময়, স্থান ও চরিত্রের আড়ম্বরহীন বিশ্বাসযোগ্য নাট্যিক আবহ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। সুর, দৃশ্যসজ্জা, চরিত্রায়ন ও অভিনয়ের স্বতঃস্ফূর্ত সংযোগে আবহমান গ্রাম বাংলার চিরচেনা নির্মল বিনোদন আসরের দৃশ্যটি এতে আপন আলোয় উদ্ভাসিত হয়। হঠাৎ গুলির শব্দে মুহূর্তের মধ্যে আনন্দ আসর ভেঙে যায়। ভয়-শঙ্কা–আতঙ্ক ঘিরে ধরে আসরে উপস্থিত সবাইকে। কারণ তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতায় জানা আছে এই ঘটনার পরে সোমজানি গ্রামে নির্বিচারে নিরাপরাধ মানুষের ওপর নির্যাতন চালানো হবে। সোমজানি গ্রামের নৌকার মাঝির মাধ্যমে যখন জানা যায় বড় পরামানিক গুলি খেয়েছে, তখন সবাই আরও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ তারা জানে যাদের জমি, পরিবার, নারীর ওপর পরামানিকদের নজর আছে কিংবা যাদের সঙ্গে পূর্ব শত্রুতা রয়েছে, তাদেরকে এবার আসামী বানানো হবে। তাদের ওপর শুরু হবে পুলিশি নির্যাতন। সোমজানি গ্রামে সাধারণ মানুষের মনের এই শঙ্কা সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনধারার নিত্য অনুসঙ্গ। নাট্যকার দারুণ শিল্পকুশলতায় সমকালীন সমাজজীবনের এই ভয়ের সংস্কৃতিকে তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরেছেন। সামাজিক বাস্তবতার এই শৈল্পিক রূপায়ন 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকটিকে এই সময়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

অভিনেতাদের মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রায়নে ভয়-শঙ্কা ও সীমাহীন দুর্ভাবনার সূক্ষ্ম অভিনয়শৈলী যথাযথভাবে ফুটে ওঠার দরুন সোমজানি গ্রামের অবদমিত মানুষের সন্ত্রস্ত মনের অবস্থা অনুধাবন করা যায়। বিশেষ করে আসমত, আহাদি মুন্সী ও মাঝি চরিত্রের অভিনেতাদের পরিস্থিতির ছন্দ অনুযায়ী যথাযথ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন দৃশ্যটিকে নাটকীয়ভাবে ঘটতে সহায়তা করে। উক্ত দৃশ্যের যথার্থ আবেদন-সৃজনে অভিনেতাদের পাশাপাশি

নাট্যনির্দেশকও সমান কৃতিত্বের দাবিদার। ভয় ও সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় সোমজানি গ্রামের সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে পালাতে উদ্যত। বড় পরামানিক গুলি খাওয়ার পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আহাদি মুন্সীর কম্পিত কণ্ঠের উচ্চারিত সংলাপে বিষয়টির তীব্রতা অনুধাবন করা আরো সহজ হয়-"আজাব শুরু হয়া গেইছে যে, আজাব শুরু হয়া গেইছে" (মামুনুর,২০১৩:১৩৩)। বিপদের ভয়াবহতা অনুমান করতে পেরে খেয়াঘাটের সেই দোকানী যখন পালাতে যাচ্ছে, তখন পরামানিকের এক লাঠিয়াল হাবিবর তাকে জিজ্ঞেস করে-

হাবিবর: "তোমরা পালাইছেন কেন?

দোকানী: সবাই পালাইছে তুইও পালাও" (মামুনুর, ২০১৩:১৩৩) ।

সোমজানি গ্রামের মানুষদের প্রতিবাদের পরিবর্তে পালিয়ে বাঁচার এই প্রচেষ্টা বিচারহীন সমাজের প্রধান প্রবণতা। নাট্যকার সার্থকভাবে সোমজানি গ্রাম ও সেখানকার মানুষকে প্রতীকী অর্থে অঙ্কন করে আসলে সমাজের পালায়নপর মানসিকতাকেই যেন তুলে ধরতে চেয়েছেন। উক্ত অভিনয় অংশে অভিনেতারা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী নীলফামারীর আঞ্চলিক ভাষাকে রপ্ত করতে। তবে অভিনেতারা যেহেতু বিভিন্ন অঞ্চলের, স্বাভাবিকভাবেই পাণ্ডুলিপিতে চিত্রিত চরিত্রভাষার সাবলীল সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলা তাদের পক্ষে খানিকটা কঠিন বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। তবে কিছু চরিত্রাভিনেতা আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ ও অভিনয়ের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন, একথা বলা যায়। অত্যাচারের দাহ সহ্য করার অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন সোমজানি গ্রামের মানুষের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণিত করে রাতের অন্ধকারে পুলিশ ও তার নিজস্ব লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে প্রচণ্ড তাণ্ডব চালায় বড় পরামানিকের পুত্র আজিজল পরামানিক। মানুষের চিৎকার আহাজারিতে সোমজানি গ্রামে এক ভয়ংকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। নাট্যনির্দেশক ঘটনা অনুযায়ী অত্যাচারের ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা ফুটিয়ে তোলার জন্য লাইটের বিশেষ ইফেক্ট ও প্রক্ষেপণ, পরিস্থিতি উপযোগী মিউজিক ও সাউন্ড এবং অভিনেতাদের আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে উক্ত বিশেষ দৃশ্যের বিশ্বাসযোগ্য আবহ সৃষ্টি করে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

এদিকে গ্রামের মানুষের অনুমান অনুযায়ী আজিজল পরামানিকের চক্রান্তে গ্রামের বাউল গায়ক পরিবারের সদস্য নিরপরাধ তেজারত, আসমত, জুলমত এবং ছাপোষা অসহায় নারী সমিরন বেওয়াকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। মফস্বলের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আজিজলের পরামর্শ ও পুলিশ ইন্সপেক্টরের মনগড়া এজাহার প্রতিবেদন উপস্থাপনের

মাধ্যমে শুরু হয় রায়; পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে থাকা একটি প্রহসনের বিচার। আজিজল ও ইন্সপেক্টরের সংলাপের মাধ্যমে মনগড়া রিপোর্ট ও সাজানো বিচারের প্রমাণ মেলে-

ইন্সপেক্টর: চিৎকার করিল বলিয়া গামছা দিয়া মুখ বাঁধিয়া ফেলে অতর্কিতে। চারদিক হইতে প্রায় বিশ হাজার জন লোক আসিয়া...

আজিজল: আরে ধুত, দেইখা পড়েন, দেইখা পড়েন।

ইন্সপেক্টর: ও বিশজন লোক আসিয়া মারিতে থাকে (মামুনুর, ২০১৩:১৩৪)।

আজিজলদের মতো দুর্বৃত্তদের হাতে আইন-বিচার ব্যবস্থা যে জিম্মি, সেই চিত্রই যেন ফুটে ওঠে 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের উক্ত বিচারের দৃশ্যে। অর্থ আর ক্ষমতার দাপটে পুলিশ,উকিল, পেশকার সবই আজিজল হাত করে নিয়েছে। তবে উক্ত দৃশ্যে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ইন্সপেক্টরের তদন্ত রিপোর্ট পেশ করবার সময়, মামলার বাদী আজিজল যেভাবে ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট পাঠকে বাধাগ্রস্ত করে, বাস্তবতার নিরিখে সম্ভবত তা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। কেননা উক্ত ঘটনায় আদালতের যথাযোগ্যতা রক্ষিত হয়নি বলেই মনে হয়। যদিও নাট্যকার এবং নির্দেশক উভয়ই তাঁদের পাণ্ডুলিপি ও প্রযোজনাতে এই নাট্যাংশের উপস্থাপন করেছেন। ঘটনার এ অংশে নিজের পেশার প্রতি ম্যাজিস্ট্রেটের গভীর নিষ্ঠার যে অভাব, তা লক্ষ করা যায়। অপরাধী এবং নির্দোষ প্রমাণের এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব পালনের সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কথা বলার ধরন লক্ষ করলে উপরিউক্ত মন্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

ম্যাজিস্ট্রেট: "আরে ধ্যাৎ, ধ্যাৎ। তাড়াতাড়ি করেন, তাড়াতাড়ি করেন, সময় নাই, জরুরি কাজ আছে, আমার ভিআইপি প্রটোকল করতে হবে, সারকিট হাউজ যেতে হবে" (মামুনুর, ২০১৩:১৩৫)।

অন্যসব তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যে কাজে রাষ্ট্র তাকে দায়িত্ব দিয়েছে সেই কাজটিই যেন তার কাছে অত্যন্ত গৌণ। মামুনুর রশীদ প্রখর সমাজ পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতার দ্বারাই চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা সত্য ঘটনার শৈল্পিক রূপ সৃজন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। একজন সচেতন মানুষ ও নাট্যদর্শক হিসেবে যা আমাদের সচেতনতা শিক্ষা ও সামাজিক-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য-বৈপরীত্যকে বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করে। এখানে 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকটি তার শৈল্পিক ও সামাজিক উৎকর্ষতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়। তৃতীয় দৃশ্যে সোমজানি গ্রামে ইনভেস্টিগেশনে এসে পুলিশের নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতার মাধ্যমে কর্তব্যের প্রতি তাদের দায়সারা মনোভাব এবং ঘুষবাণিজ্যের প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হয়–

সাব-ইন্সপেক্টর: তাহলে আর খুঁজে লাভ কি? চলেন চলেই যাই।

পুলিশ: ডিউটি স্যার, ডিউটি! ওসি সাব নিজেও জানেন আমরা আসামি ধরতে পারব না। যা ধরার উনি নিজেই সাফ করে নিয়ে গেছেন (মামুনুর, ২০১৩:১৩৭)।

এরকম লোক দেখানো সাজানো ইনভেস্টিগেশান কিংবা প্রকৃত অপরাধী চিহ্নিত না করে, কারো ব্যক্তিগত আক্রোশ বা ইচ্ছাকে চরিতার্থ করবার জন্য নিরাপরাধ মানুষকে হয়রানি ও দণ্ডপ্রদানের এক নিষ্ঠুর ছবি ফুটে ওঠেছে 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকে। নাট্যকার মামুনুর রশীদ সোমজানি গ্রাম ও সেখানকার মানুষকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে, সমাজের কথিত ক্ষমতাশালীরা পুলিশকে দিয়ে, প্রতি পদে পদে গরিব মানুষকে যে কীভাবে নির্মম অত্যাচার করে, তার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন। পাশাপাশি পুলিশের ঘুষবাণিজ্যের নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি সামাজিক অবক্ষয়ের আসল চিত্রটি পাঠক ও দর্শকের চোখের সামনে উন্মোচন করে–

পুলিশ: এই জেলায় আছেই মাত্র তিনডে ওসি। একবারে সেপাই থেকে ওসি। বড় সাহেবরা ওনাকে কেমন আদর করে রেখেছেন। বাজারের বড় মাছটা, মুরগিটা, খাসিটা সব কিনে দিয়ে আসে। আর এসপি সাহেবের শালার বিয়ের পুরো বউ ভাতের দায়িত্বটা নিজেই নিলেন ওসি সাহেব (মামুনুর, ২০১৩:১৩৭)।

শিল্পে সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতির এই অসঙ্গতি-অনিয়মের সূক্ষ্ম রূপায়ণ তখনই সম্ভব, যখন শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এ বিষয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ বিদ্যমান থাকে। 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের সংলাপ ও চিন্তা বিশ্লেষণে মানুনুর রশীদের পর্যবেক্ষণ ও তাঁর পুনঃসৃজন ক্ষমতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই দৃশ্যে অবশ্য অভিনেতাদের চরিত্রানুগ অভিনয় ক্ষমতার কিছু সীমাবদ্ধতা চোখে পড়ে। বিশেষ করে নাট্যঘটনায় প্রদত্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী ফিজিক্যাল চরিত্রায়নের সঙ্গে চরিত্রের সংলাপ এবং সংলাপের অর্ন্তনিহিত অর্থ প্রকাশের সাবলীলতায় কিছুটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। প্রযোজনার এই অংশ চরিত্র নির্মাণে নির্দেশকের আরও মনোযোগ দাবি করে।

পুলিশের সাজানো এই তদন্তের সাথে সাথে নাট্যঘটনা এগিয়ে চলে। গ্রামের সব পুরুষ মানুষ আত্মগোপনে রয়েছে, কারণ তারা জানে পুলিশ তাদের দেখলেই হয়রানি শুরু করবে। সে যেই হোক, অপরাধ করেছে কি করেনি, সেটা মুখ্য নয়। এই অবিচার তারা সহ্য করে আসছে যুগের পর যুগ ধরে। সবরকম প্রতিবাদের ভাষা ভুলে তারা অত্যাচারের যন্ত্রণা সইবার অসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করেছে। সোমজানি গ্রাম যেন বাঙালির অত্যাচারিত হওয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রতীক। পুলিশের সঙ্গে আহাদি মুন্সীর আলাপে এ বিষয়টি উঠে আসে-

সাব-ইন্সপেক্টর: গ্রামে একটা মানুষও নেই?

আহাদি: সব আছে বুইঝলেন। সব আছে। তোমারে আওয়াজ শুনি সব পলাইছে। হামরা পলানো শিখছি ভাল। সেই যে ব্রিটিশ আসিল আর লাল পাগড়ি দেখলি সবাই পগার পার। তারপর পাকিস্তানে, বাংলাদেশ। পুলিশ আসলি হারা বুঝি। বালা মসিবত চলি গেইলে গর্ত থাকি ব্যাড়ে আসি (মামুনুর, ২০১৩:১৩৯)।

জীবন অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ আহাদি মুন্সী চরিত্রটি অসাধারণ দক্ষতায় অঙ্কন করেছেন নাট্যকার। এই চরিত্রে রূপদানকারী অভিনেতাও শৈল্পিক নান্দকিতায় সৃজন করেছেন চরিত্রটিকে। চরিত্রটির আর্বিভাবে নাট্যঘটনায় কল্যাণ, শুভবোধ ও অব্যক্ত প্রতিবাদের আভাস ফুটে ওঠে। ঘটনাবিন্যাসের এই অংশে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের উন্মোচন হয়। যিনি একজন নারী এবং যে পরিবারের নির্যাতনে অতিষ্ঠ সোমজানি গ্রামের মানুষ, সেই পরামানিক পরিবারের ছেলে আজিজল পরামানিকের স্ত্রী। পরামানিক বাড়ির বউ হয়েও নারী বলে নানাভাবে সে নির্যাতিত, নিগৃহীত। বলা হয় যে "নির্যাতিতের মধ্য থেকেই নতুন মানুষের সৃষ্টি হয়" (জিয়া, ২০০৭:১৭৬), যে মানুষ অত্যাচারিতের নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবে, ভাঙবে ভয় ও 'নীরবতার সংস্কৃতি'। 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকে আজিজলের স্ত্রী যেন সেই নতুন মানব। যদিও নাট্যকার নতুন নামকরণ করেননি নতুন মানবের। কিন্তু নাটকটি বিশ্লেষণের একটি পর্যায়ে পৌঁছে মনে হয়, আপন আলোয় উদ্ভাসিত নারী চরিত্র 'আজিজলের বউ বা স্ত্রী' নামকরণ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের নামে পরিচিত হতে পারত। নাটকের শেষদিকে পরামানিকদের নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং ওই বাড়ির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা নারীকে 'আজিজল পরামানিকের স্ত্রী' হিসেবে পরিচয় না করিয়ে, নারী চরিত্রটিকে নিজের নামে প্রতিষ্ঠা করে নাট্যকার পুরুষতান্ত্রিক বিধানে আঘাত হানতে পারতেন। নাটকের ঘটনাক্রমে দেখা যায় যে দ্রোহের বার্তা নিয়ে মানবিক মমত্বে নিরীহ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সেই নারী। চরিত্র হিসেবে নাটকে প্রবেশের শুরুতেই তার উদার ও সহমর্মী মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, যখন সে আহাদি মুন্সীর মতো একজন অসহায় বৃদ্ধ প্রতিবেশীর খাবার ব্যবস্থা করে দেয়।

'রাষ্ট্র বনাম' নাটকে আহাদি মুন্সী ও আজিজলের স্ত্রী যেন স্রোতের সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে সত্য, শুভ ও প্রতিবাদের চেতনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অন্য প্রায় সব মানুষ যখন পরামানিকদের ভয়ে কম্পমান, তটস্থ, তখন আহাদী মুন্সীর বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিবাদ এবং বিশেষ করে আজিজলের স্ত্রীর নির্ভয়ে সামনে এগিয়ে চলার দৃঢ় প্রত্যয় নিঃসন্দেহে নাট্যকাহিনির অন্যতম শক্তিশালী অংশ। কৈবর্ত বাড়িতে নির্যাতন প্রসঙ্গে পুলিশের সঙ্গে আহাদী মুন্সীর কৌশলী কথনে তার প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে- "কৈবর্ত বাড়িত আগুন

ধরিল। পুড়িও গেইল। কিন্তু পুলিশ আসিল না বাহে" (মামুনুর, ২০১৩:১৪০)। কিন্তু এখন সোমজানি গ্রামে পুলিশের আনাগোনা ও ভয়ে সবাই আত্মগোপনে রয়েছে। হিন্দু কৈবর্ত বাড়ির সবাই সপরিবারে নিহত হলেও, তাদের ঘরবাড়িতে আগুন দেয়া হলেও তখন পুলিশ আসে না, কিন্তু বড় পরামানিক খুন হলো আর পুলিশ এসে তাণ্ডব চালালো নিরীহ নিরাপরাধ মানুষের ওপর। অর্থাৎ আইন সবার জন্য সমান নয়। কিন্তু সমাজের ওই পরামানিকরাই কৈবর্ত বাড়িতে আগুন লাগায়, বাড়ি দখল করে, ধর্মান্ধতাকে ব্যবহার করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা লাগিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিরোধীরা আজও এদেশে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব যে নষ্ট করতে চায় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যে ধর্মান্ধরা এখনও ব্যর্থ করবার চেষ্টায় লিপ্ত, 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকে মামুনুর রশীদ এই সংগুপ্ত সত্যের উন্মোচন ঘটিয়েছেন–

> বৃদ্ধ আহাদী মুন্সীর জবানিতে বিষয়টি আরও গভীরতা নিয়ে ধরা দেয়-
>
> ঐ যে একাত্তর দেখছু, পয়ষট্টি দেখছু আবার ছেচল্লিশও দেখছু, সবসময় দাঙ্গা নাগাইছে ঐ পরামানিক, তালুকদার, চৌধুরী, খা এরা দাঙ্গা নাগাইছে না? ঐ যে তুলশীতলা ওডাকার এ ভিটে? এডাই বা কার? (মামুনুর, ২০১৩:১৪১)।

'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের এ পর্যায়ে এক কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্রের আগমন ঘটে মঞ্চে, যিনি পেশায় একজন ডাক্তার এবং সম্প্রতি খুন হওয়া বড় পরামানিকের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তৈরি করেছেন। রিপোর্ট তৈরি করা সেই ডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে আজিজল তাঁকে রিপোর্ট পরিবর্তন করে দিতে বলেন। কারণ আজিজল পরামানিক নিরাপরাধ তেজারত, আসমত, জুলমত ও সমিরন বেওয়াকে দোষী সাব্যস্ত করতে দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে মারা হয়েছে, ইন্সপেক্টরকে দিয়ে এজাহারে এই কথা লেখান। কিন্তু ডাক্তারের করা পোস্টমর্টেম রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে বুলেট ইনজুরিতে তার মৃত্যু হয়। সেটা সত্যিকারের কারণ। কিন্তু বুলেটে মৃত্যু হলে তো বাউল গায়ক ফকিরগোষ্ঠীকে ফাঁসানো যাবে না। কারণ আসমত জুলমতদের মতো নিরীহ সাধারণ মানুষ বন্দুক দিয়ে কাউকে হত্যা করবে, এটা প্রমাণ করা যাবে না। তাই ডাক্তারের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পরিবর্তন করতে হবে। সেক্ষেত্রে আজিজল অনেক রকম চেষ্টা করেও যখন বিফল হচ্ছিল, তখন সে সুকৌশলে ডাক্তারের দুর্বল জায়গা ধর্মকে ব্যবহার করেন রিপোর্ট ম্যানিপুলেট করতে। আজিজল খুঁজে বের করেন, ডাক্তার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী পাকিস্তানি বাহিনীর এ-দেশীয় দোসর রাজাকারের সন্তান, যে কিনা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়েছিল। ডাক্তারের ভাষায় শহিদ হয়েছিল। তাই ডাক্তার যখন তাঁর বাবার বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারেন বড়

পরামানিক ছিলেন একজন ইসলামের সাচ্চা সিপাহী এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন চেষ্টা করে গেছেন, হিন্দুদের সাথে মিলে কিছু দেশদ্রোহী তাঁকে হত্যা করেছে এবং ওই হত্যাকারীদের বিচার হওয়া দরকার, তখনই ডাক্তার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পরিবর্তন করতে রাজি হন। ডাক্তারের ভাষ্যমতে কখনও কখনও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ঘটনার নতুন ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। তিনি স্বীকার করেন তিনি যা করেছেন, তা দলের স্বার্থে, ইসলাম রক্ষার স্বার্থে। কিন্তু সোমজানি গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দাদের মতে বড় পরামানিক মিলিটারি দিয়ে পুরো গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মমভাবে সপরিবারে কৈবর্তদের খুন করা হয়েছিল। শেষে কৈবর্ত সাহার সব কিছু লুট করে তাদের ভিটেমাটি দখল করেছিল ওই বড় পরামানিক।

নাটকের এ অংশে ডাক্তারের ধর্মান্ধতা ও তার পূর্ব পরিচয়কে উন্মোচনের মাধ্যমে একাত্তরের পরাজিত দেশদ্রোহীদের বীজের পাকাপোক্ত অবস্থানের সন্ধান ও ধর্মীয় গোড়ামির প্রকৃষ্ট উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। নাট্যকার মামুনুর রশীদ অত্যন্ত নিপুণভাবে সমসাময়িক দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে ইতিহাসের দুষ্কৃতিকারীদের এক দারুণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন, যা নিঃসন্দেহে নাটকটিকে ভাবনার গভীরতা ও ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। আজিজল ও ডাক্তার চরিত্রে রূপদানকারী অভিনেতাদ্বয় নাট্যঘটনার এই মনস্তাত্ত্বিক জটিল অনুভূতিকে যথাযথভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন একথা বলা যায়। এছাড়া দৃশ্যের সার্বিক আবহ ও স্পেসের ব্যবহারে নির্দেশকের বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল প্রয়োগে দক্ষতার প্রমাণ মেলে। একই অবজেক্টের নানা রূপে ব্যবহারের মাধ্যমে দৃশ্যসজ্জার পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্যময় নতুন স্পেসের সৃজন নিশ্চয়ই আধুনিক ভাবনায় থিয়েটার নির্মাণের পরিচয় বহন করে।

নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে জেলখানার বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে নির্দেশক নিরাভরণ মঞ্চসজ্জা কৌশল প্রয়োগ করেছেন, যেখানে সাজেসটিভ কিছু উপকরণ ও সেট প্রপস ব্যবহারের মাধ্যমে একটু আগে ডাক্তারের বাড়ি হিসেবে ব্যবহার হওয়া স্পেসটি বিশ্বাসযোগ্যভাবে জেলখানায় রূপান্তরিত হয়, যা এক কথায় শিল্প নির্মাণে সূক্ষ্ম সুকৌশল ও নান্দনিকতাবোধের পরিচায়ক। এছাড়া এই অংশে আসমত, জুলমত ও তেজারতের অভিনয়, বিশেষ করে আসমত চরিত্রের অভিনেতার চরিত্র নির্মাণে আঙ্গিক, বাচিক ও মনস্তাত্ত্বিক অভিনয় দক্ষতায় দৃশ্যটির গভীর তাৎপর্য দর্শকদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। অপরাধ না করেও দোষী সাব্যস্ত হওয়া নিরাপরাধ মানুষের নিদারুণ কষ্টের যে নাট্যদৃশ্য এখানে তৈরি হয়, তা দর্শকদের আবেগীয় স্তরকে স্পর্শ করে। পাশাপাশি নাট্যঘটনার বক্তব্য মানুষকে এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ করে। 'রাষ্ট্র বনাম'

নাটকের উদ্দেশ্যবাদী এই চিন্তন নিঃসন্দেহে নাটকটিকে শিল্পকর্ম হিসেবে প্রশংসনীয় স্তরে পৌঁছে দেয়। এছাড়া জেলে বসে আসমতের করুণ স্মৃতিচারণ নাট্যঘটনার সঙ্গে দর্শকদের আবেগীয়ভাবে সংযুক্ত করে-

> কৈবর্ত বাড়িত হামলা হইল, আগুন নাগে দিল, কৈবর্তের বেটি সাবিত্রী ওক ধরি নিয়া বাহে বেজ্জতি করিল। বেজ্জতি আয় কওছুকি বাহে একবারে শ্যাষ করি ছারিল। বড় পরামানিক কইল মালাওনের গুষ্টিরে শ্যাষ করি দাও। ঐ হেন্দুস্থানত নাকি কি শুরু হইছে, আচ্ছা বাহেন তোমরা কবার পন ঐ হেন্দুস্থান কি শুরু হইছে? (মামুনুর, ২০১৩:১৪৫)।

'রাষ্ট্র বনাম' নাটকে নিরীহ আসমতের অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি এই সহমর্মিতার দৃষ্টান্ত নাটকটির অসাম্প্রদায়িক চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। এদিকে কোর্টে ধর্মান্ধতার কারণে ডাক্তার যে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পরিবর্তন করেছেন, জলিল উকিলের জেরার মুখে ডাক্তার তা স্বীকার করার পর সাময়িকভাবে আজিজলের হীন পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। আজিজলের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেলে সে উত্তেজিত হয় এবং কোর্টে অনভিপ্রেত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি জলিল উকিলের শার্টের কলার চেপে ধরে এবং বৃদ্ধ মোক্তারকেও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। আসমতদের পক্ষের এই জলিল উকিলকে আজিজল অশ্লীল বাক্যবানে বিদ্ধ করতে থাকলে, মুক্তার আজিজলকে উদ্দেশ্য করে বলে-

> মুক্তার: এই কি করছো আজিজল
>
> আজিজল: চুপ শালা বুড়া। শালা জিন্দেগিভর আমার বাপের টাকা খেয়ে এখন প্রশ্ন করো উল্টাপাল্টা, সব শালা বাইনচোদ। (এই বলে আজিজল জলিল উকিলের কলার চেপে ধরে তাকে মারতে উদ্যত হয়)।
>
> জলিল: পিপি সাহেব, মুক্তার চাচা এই কলারতো আমার ধরেনি, টোট্যাল লইয়ার কমিউনিটিকে ধরেছে (মামুনুর, ২০১৩:১৬৯)।

আসলেই একটি রুগ্ন সমাজের মূল্যবোধ অবক্ষয়ের এই নাট্যিক চিত্র অনন্য দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার মামুনুর রশীদ। আজিজলরা ক্ষমতা আর অবৈধ অর্থের দাপটে আইন-আদালত কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা করছে না। এ যেন অস্থিতিশীল ও অস্থির সমাজের একখণ্ড প্রকৃত ছবি। আইন-আদলতকে অপমান-অবমাননা করে সাময়িক একটু সমস্যা অনুভব করলেও বসে থাকে না আজিজলের মতো দুর্বৃত্তরা। কোর্ট ইন্সপেক্টর, উকিল, আমলা এমনকি ইন্সপেক্টরের স্ত্রীকে পর্যন্ত ক্ষমতা আর অর্থ দিয়ে আজিজলরা যেন কিনে নিয়েছে। কোর্ট ইন্সপেক্টরের বাড়ির দৃশ্যে উক্ত প্রসঙ্গের সত্যতা নিশ্চিত হয় –

> ইন্স: স্ত্রী: (আজিজলকে) আমাদের একটা উপকার করেন না দয়া করে।
>
> আজি: আরে দয়া কি বলছেন, হুকুম করেন হুকুম, অর্ডার অর্ডার।
>
> স্ত্রী: আমাদের একটা পোস্টিং হয়েছে চাটগায়ে কিন্তু এসপি সাহেব কিছুতেই রিলিজ করছেন না।
>
> আজি: সে হবে, আমাদের তো আবার মন্ত্রী-মিনিস্টার আমলা-গামলা থাকতেই হয় (মামুনুর, ২০১৩:১৪৮)।

এছাড়াও সেনাবাহিনীর প্রাক্তন মেজর আজিজলের দুলাভাইয়ের সুপারিশ ও পরামর্শ অনুসরণ করে অচিরেই স্বরূপে ফিরে আসে আজিজল। উপরিউক্ত প্রসঙ্গের মাধ্যমে নিশ্চয়ই নাট্যকার রাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্র প্রভাব বিস্তারকারী আজিজলদের লম্বা হাতের বাস্তবিক ঘটনার অনুকরণ করেছেন। তবে নাট্যনির্দেশক উপরিউক্ত নাট্যাংশটুকু সম্পাদনা করে প্রযোজনা সাজিয়েছেন। এক্ষেত্রে নির্দেশকের ভাবনায় হয়তো নাটকের স্থিতিকাল (Duration)-এর বিষয়টি কাজ করে থাকতে পারে। তবে মঞ্চ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকটি যে কোনো ডিজাইনারের জন্যই কিছুটা চ্যালেঞ্জিং বৈকি। কারণ নাট্যঘটনাসমূহ অনেক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংঘটিত হয়। কিন্তু সেই স্থান পরিবর্তনের জন্য বা দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য নির্দেশকের হাতে খুব বেশি সময়ের অবকাশ থাকে না। উক্ত অংশটুকু বাদ দেয়ার পেছনে মঞ্চ পরিকল্পনার উক্ত সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও নির্দেশক ভেবে থাকতে পারেন। কিন্তু আজিজলদের মতো অপরাধীদের সঙ্গে সমাজের অদৃশ্য অশুভ শক্তির যোগসাজশকে বোঝার জন্য উক্ত দৃশ্যটির মঞ্চ রূপায়ণ হলে নাট্য প্রযোজনায় শক্তিশালী একটি প্রসঙ্গ যোগ হতে পারত বলে মনে হয়।

অত্যাচার-নিপীড়নে সোমজানি গ্রামের মানুষ যে নীরবতার সংস্কৃতির মধ্যে বাস করছে এবং মেনেই নিয়েছে যে নির্যাতন সয়ে যাওয়াই তাদের নিয়তি, সেখানে আজিজলের স্ত্রীর ওই প্রতিরোধ ও প্রতিবাদী চেতনা নাটকটিকে অজটিল ও একমুখি ধারা থেকে দ্বান্দিকতায় প্রবেশ করায়; মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এই অস্থির পৃথিবীতে দ্রোহী ও বিবেকবোধসম্পন্ন মানুষের অস্তিত্বের জানান দেয়। ওই চরিত্রের মুখনিঃসৃত সংলাপ উপরিউক্ত বিষয়টির মমার্থ অনুধাবনে সাহায্য করতে পারে– (স্বামী আজিজলকে) "সম্মান করি কথা কন। এত বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। এডা সোমাজানি গ্রাম না, এডা নীলফামারী" (মামুনুর, ২০১৩:১৭৬)। সত্যিকার অর্থেই এই মানসিক দৃঢ়তা নিয়েই এগিয়ে চলে চরিত্রটি। এখানে লক্ষণীয় যে আজিজলের দোর্দণ্ড প্রতাপ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানানোর সাহস 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের এই নারী চরিত্রটিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। আজিজলের মতো হিংস্র লোকের চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করার মানে

কিন্তু পুরুষশাষিত রাষ্ট্রের অনেক কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু সে নির্ভীক চিত্তে রুখে দাঁড়িয়েছে আজিজলের সকল অন্যায়-অবিচারের। শুধু তাই নয়, কৈবর্ত পরিবারের একমাত্র জীবিত শিশুসন্তানকে বুকে তুলে নিয়েছে, যে কৈবর্ত পরিবারের সবাই পরামানিকদের দ্বারা নিহত হয়েছে। আজিজল তথা সমাজে ঘটে চলা দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিরীহ, অত্যাচারিত মানুষের হৃদয়ে প্রতিবাদী চেতনা, স্বপ্ন ও নতুন করে বাঁচবার আশা জাগানিয়া নারীই পরামানিক বাড়ির বউ।

কৈবর্ত পরিবার নিহতের প্রকৃত ঘটনা এবং বড় পরামানিক হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী কিছু সাক্ষীকে নিয়ে প্রকৃত সত্য উপস্থাপনের জন্য কোর্টে যাওয়ার সময় স্বামী আজিজলের তীব্র অপমানে ভেঙে না পড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় সে-

> আজিজল: তুই এতদূর আলু কেমন করি?
>
> বউ: সম্মান করি কথা কন।
>
> আজিজল: কিসের সম্মান, বানজা মাগি এই ছোট লোকের বাচ্চাদের তুই কোর্ট পর্যন্ত নিয়া আসছিস।
>
> বউ: দেখেন অত বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না, এডা সোমজানি গ্রাম না। এডা নীলফামারী।
>
> আজিজল: এই তুই নীলফামারীতে তুই হামাক ভয় দেখাস। এই কোর্ট কাছারি থানা পুলিশ সব মোর কেনা। কৈবর্তের ঘরের ছাওয়া তোর কোলত, ঘেন্না করেনা?
>
> বউ: না, ঘেন্না লাগে এখন পরামানিক বাড়ির মাটি পাড়াইতে।
>
> আজি: এই ঘোমটা দে, ঘোমটাদে।
>
> বউ: না এটা সোমজানি গ্রামের পরামানিক বাড়ি না, ঘোমটা আর এই জনমে দেইম না (মানুনুর, ২০১৩:১৭৬)।

সমাজে ত্রাসের রাজত্ব গড়ে তোলা পরামানিকদের সঙ্গে বুক চেতিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এরকম প্রতিবাদী নারী চরিত্র সৃষ্টি নাট্যকার মামুনুর রশীদের দ্বারাই সম্ভব। কারণ তিনি বিদ্রোহ-বিপ্লবের নাট্যকার। দ্রোহ তাঁর নাটকের ভাষা। স্বামী হওয়া সত্ত্বেও দুর্বৃত্ত আজিজলের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করা, পরামানিকদের দ্বারা অত্যাচারিত ও নিহত হিন্দু ধর্মাবলম্বী কৈবর্ত পরিবারের একমাত্র জীবিত শিশুসন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করা কিংবা বিনা অপরাধে সাজা পেতে যাওয়া ফকির পরিবারের রক্ষার জন্য শত প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে সাক্ষী প্রদান করা, এসব কিছুর মাধ্যমে "রাষ্ট্র বনাম" নাটকের শক্তিশালী নারী চরিত্র আজিজলের স্ত্রী পলায়নপর অসংবেদনশীল সমাজকে মুক্তিমন্ত্রে আহ্বান করেন- "ভয়! ভয় করেনা! জীবন কয়ডা, মরবু, মরবু না? শোন! শোন চামচিকার মতো মরা যায় আবার

তেলাচোরার মতোও মরা যায়, ফির বাঘের মতো গর্জন করতে করতেও মরা যায়" (মামুনুর, ২০১৩:১৭২)। শোষিত-নির্যাতিত মানুষের ভেতর থেকে নিঃসৃত এই সাহসী উচ্চারণ নিশ্চয়ই নতুন ভোরের সুর শোনায়।

কিন্তু অর্থ ক্ষমতা আর প্রভাবশালীদের মনরক্ষার রায়ের ফল যেন পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে আছে। তবুও প্রফেশনাল আদর্শে অবিচল মানুষ জলিল উকিল নির্দোষ আসমতদের পক্ষে লড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। লোক দেখানো বিচারের আনুষ্ঠানিকতায় একটি মিথ্যাকে সত্য বানানোর আইনগত অপকৌশলের বিরুদ্ধে তাঁর এই লড়াই। তথ্যপ্রমাণ ও সম্ভাব্য সকল অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে জলিল উকিল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বড় পরামানিক হত্যার সঙ্গে আসমত, জুলমতরা জড়িত নয়। পরামানিকের হত্যার সাথে জড়িয়ে আছে ভিন্ন বিষয়। বহু বছর ধরে সংঘটিত পুঞ্জিভূত অন্যায়ের প্রতিশোধ হিসেবে অজ্ঞাতনামা আততায়ীদের হাতে নিহত হয়েছে পরামানিক। রাষ্ট্রের পক্ষে কে বা কারা তাকে হত্যা করেছে, যেমনটি হয়ছিল এদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময়। কিন্তু দেশে কোনো সিভিল ওয়ার অথবা ওয়ার সিচ্যুয়েশন নেই যে তার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের পক্ষে গুপ্তহত্যার প্রয়োজন পড়বে। এটা নির্বোধের দাবি বলে উড়িয়ে দেন ব্যারিস্টার সাহেব। তখন আইন আদালতের কঠোর বিধির বাইরে গিয়ে জলিল উকিল প্রশ্ন জুড়ে দেন রাষ্ট্রের প্রতি। একজন হতভাগা রিপ্রেশড (Repressed) উকিল শোষিত নির্যাতিত মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের ভূমিকা জানতে চান "আজ পরামানিকের পক্ষে রাষ্ট্র এসে দাঁড়িয়েছে ... সোমজানি গ্রামের জয়দেব কৈবর্ত, হাজার হাজার মানুষ তারা, তারা কি রাষ্ট্র নয়"? (মামুনুর, ২০১৩:১৮০)। কিন্তু আদালত জলিল উকিলকে স্মরণ করিয়ে দেয়, এটা বক্তৃতার মঞ্চ নয়, তাকে ল পয়েন্টে কথা বলতে হবে। কিন্তু জলিলের প্রতিবাদী কণ্ঠ থামে না–

> সে আমি জানি। কিন্তু এই কোর্ট এই দেশ ও জাতির বাইরে কোনো অস্তিত্ব নয়। মানুষকে মহত্তম সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করাই রাষ্ট্রের কাজ। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাসে দেখছি, খুনি ও ডাকাতদের এই আইনই এসে আগলে রাখছে, দম্ভকে বাড়িয়ে দিচ্ছে (মামুনুর, ২০১৩:১৮০)।

আজিজলের স্ত্রীর আপ্রাণ চেষ্টা, ডাক্তার ও আহাদি মুন্সীর স্বীকারোক্তি এবং জলিল উকিলের তথ্য-উপাত্ত, সাক্ষী-প্রমাণ সবকিছুকে উপেক্ষা করে শব্দহীন পাঠের রায়ে সাজা হয় অপরাধ না করা নিরীহ ফকিরদের। নাট্যকার নাটকের শেষের দিকে আজিজলের স্ত্রীর সাক্ষ্য ও জজের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা দুটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তই শব্দহীন ভঙ্গি (মাইম) কৌশলের দ্বারা সংঘটিত করেছেন। এই বিমূর্ত নাট্যমুহূর্তটুকু সম্পূর্ণ ঘটনাবিন্যাসের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার এই নাট্যিক মুহূর্ত যেন সমগ্র নাট্য ঘটনার

প্রতীকী চিত্র। একটি মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার হীন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এ এক মৌন প্রতীকী প্রতিবাদ। অর্থ আর ক্ষমতার দাপটে প্রভাবিত বিচারের রায় কী হবে, তা যেন সবাই আগে থেকেই জানে, সেজন্যই হয়তো নাট্যকার রায়ের পাঠে শব্দ ব্যবহার না করে নীরবতার আশ্রয় নিয়েছেন। শব্দ ও কথার এই সাময়িক বিচ্যুতি যেন আরো গভীর অর্থবোধকতা নিয়ে দর্শক ও পাঠককে নাট্যঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত করে।

নাট্যকারের দৃশ্যবর্ণনা এবং কুশীলবদের পরিস্থিতির ছন্দ অনুযায়ী যথার্থ অভিনয় উক্ত দৃশ্যে এক আবেগঘন মুহূর্ত সৃষ্টি করে। এছাড়া এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, জলিল মুক্তার, পিপি, ব্যারিস্টার ও জজ এসব পুরুষ চরিত্রে নারী অভিনেত্রীরা দুর্দান্ত অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। একজন দর্শকের পরিপ্রেক্ষিত থেকে একথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে প্রযোজনা প্রত্যক্ষণে পুরুষ চরিত্রে নারী অভিনেতার এই চরিত্রায়ন নাটকের শৈল্পিক রসাস্বাদনে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। নাট্যকারের পাণ্ডুলিপি নির্দেশকের ব্যাখ্যা ও সৃজনশীল প্রযোজনা নির্মাণ কৌশলের প্রয়োগে 'রাষ্ট্র বনাম'-এর পরিবেশনায় অভিনবত্ব ফুটে ওঠে। এছাড়া বাহুল্যবর্জিত ও বুদ্ধিদীপ্ত মঞ্চপরিকল্পনায় সৃষ্ট স্থান ও সময়ের বিশ্বাসযোগ্য চিত্রায়ন এবং চরিত্রের সামাজিক অবস্থানুযায়ী পোশাকের ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে দৃশ্যের লয় ও ছন্দ আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে আবহসংগীত নিয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে বলে মনে হয়। তবে অভিনেতারা নাট্যঘটনা অনুযায়ী বিশ্বাসযোগ্য ক্রিয়া সম্পাদনে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনিভাবে চরিত্রের বয়স এবং জেশ্চার নিয়ে আরও একটু মনোযোগী হতে পারতেন। পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষা আয়ত্বে কয়েকজন অভিনেতার আরও শ্রমের প্রয়োজন। এছাড়া আখ্যানভাগের কিছু অংশ যেমন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রসঙ্গ, কৈবর্তদের সপরিবারে নিহতের ঘটনা এবং তাদের একমাত্র জীবিত শিশু সন্তানকে আজিজলের স্ত্রীর দায়িত্ব নেয়া, আজিজলের স্ত্রীর ফকিরদের ভিটায় অবস্থান, কৈবর্তের শিশু সন্তানকে লালন-পালন এবং ফকিরদের জামিনের জন্য নিরলসভাবে আজিজলের স্ত্রীর কাজ করে যাওয়া প্রসঙ্গগুলো যদি নির্দেশক আর একটু কম সম্পাদনা করতেন, তাহলে প্রযোজনা আরও বৃহত্তর ব্যঞ্জনা নিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হতে পারত বলে বোধ হয় যদিও নির্দেশকের ব্যাখ্যা ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে নির্ধারিত নাট্যাংশে নির্মিত 'রাষ্ট্র বনাম'-এর মঞ্চরূপায়ণ দর্শকদের আবেগ ও চিন্তনকে দারুণভাবে আলোড়িত করে।

ধর্মান্ধতাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের হীন চিন্তা যেন আজ পৃথিবীর সর্বত্র। 'রাষ্ট্র বনাম' নাটকের গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ ধর্মান্ধতাকে উস্কে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগানো এবং পরামানিকদের মতো দখলদারদের মনোবাসনা পূরণের

হীন মনোভাব সমসাময়িককালে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ধর্মান্ধতা, অন্যায় বিচার, নীরবতার সংস্কৃতি, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের রূঢ় বাস্তবতার চিত্রায়ন ও পাশাপাশি শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সীমাহীন যন্ত্রণা সয়ে কিছু মানুষের মাথা উঁচু করে কথা বলা, মানুষের প্রতি মমত্ব, সহমর্মিতা এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো চেতনার নাট্যিক ভাষ্য 'রাষ্ট্র বনাম'।

পরিশেষে মামুনুর রশীদের 'রাষ্ট্র বনাম' সমকালের প্রতিভাসে হয়েও জীবনদৃষ্টির গভীরতার গুণে তা সমকালকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত, যেখানে সমাজজীবন চিত্রিত হয়েছে বহুমাত্রিকতায়, বিভিন্ন ভঙ্গিতে এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে। সৃজনধর্মী শিল্প হিসেবে নাট্যকারের কল্পিত ঘটনাবিন্যাস ধারণ করেছে সমকালীন সমাজের নানা অসাম্য ও অসঙ্গত চরিত্রের আদল। "নিজের কালের নিজের সমাজের মানুষও সেখানে আপনাকে আবিষ্কার করে এবং আপন সমাজের নানা জটিল প্রশ্ন হঠাৎ তার চিত্তকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে তোলে" (কবীর, ১৯৮১:১৬০)। অশুভ শক্তির সঙ্গে আপাত পরাজয় হলেও আহাদী মুন্সী, আজিজলের স্ত্রী ও জলিল উকিলের নীরব লড়াই নাটকটিকে দাহ কিংবা শুধুমাত্র যন্ত্রণা সহ্য করবার আখ্যান হিসেবেই প্রতীয়মান করে না, জলিল উকিল, আহাদী মুন্সী, আসমত, তেজারত, সোমজানি গ্রামের আরও অনেক মানুষ এবং পরামানিক বাড়ীর স্ত্রীর মুক্তির চেতনা 'রাষ্ট্র বনাম' নাটককে দ্রোহের শিল্পভাষ্যে উত্তীর্ণ করে, যেখানে "পরাজয় নিশ্চিত জেনেও কিছু সৈন্য যুদ্ধ করে যায়" (মামুনুর, ২০১৩:১৮৩)।

টীকা

১. স্বাধীনতা বাংলাদেশের নবনাট্যচর্চার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশের মানুষ সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জন করে। শুরু হয় নতুন উদ্যমে সৃজনশীল সাংস্কৃতিক চর্চা। তারই ধারাবাহিকতায় ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ 'কবর' নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে মামুনুর রশীদের হাত ধরে 'আরণ্যক'-এর যাত্রা শুরু হয়। যদিও "আরণ্যক'-এর ভ্রূণের জন্ম হয়েছিল ১৯৭১ সালের সেই টালমাটাল দিনগুলোতে" (আশিস, ২০০১:৩৯) 'আরণ্যক একটি দলের নাট্যকথা' গবেষণাগ্রন্থের ভূমিকার 'প্রকাশনা প্রসঙ্গে' অংশে 'আরণ্যক'-এর নাট্যচর্চার মূল আদর্শকে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

   আরণ্যক সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক শক্তির হুমকি উপেক্ষা করে মানুষের ভেতরে মানবিকবোধ ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ ও দেশ গঠনের সংগ্রামে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। মুক্ত নাটক আন্দোলনের মাধ্যমে নাটককে জনগণের শিল্পে পরিণত করতে 'আরণ্যক' কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে। শিল্পের প্রতি আমরা অনুগত, তার চেয়ে অনুগত

মানুষের প্রতি। সে মানুষ স্বদেশের, সমগ্র বিশ্বের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। মানুষের এক বিশেষ অংশের প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্ব রয়েছে, সে অংশ হলো শ্রমজীবী মানুষ (দুলাল, ২০১৩)।

২. প্রত্যেক নাটকেরই একটি মূলভাব বা নাট্যকারের একটি প্রতিপাদ্য কিছু থাকে। জন হাওয়ার্ড লসন একেই বলেছেন "root idea" বা "ভাববীজ" (দুর্গাশংকর,২০০৩:৪৬)।

৩. 'সিলেকটিভ রিয়ালিজম' (Selective Realism) মঞ্চে হুবহু বাস্তবকে আনবার চেষ্টা না করে তার কিছু অংশ নিয়ে এসে বাস্তবের প্রতীতি জন্মানো এবং পরিবেশ রচনা করে নেওয়াই এই রীতির উদ্দেশ্য।

সহায়কপঞ্জি

অলোক বসু, ২০১৯। 'বাংলাদেশের নাটক সম্ভাবনার সংকেত', *উত্তরাধিকার*, নতুন অভিযাত্রা ১, সংখ্যা-১ বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১০৩।

আশিস গোস্বামী [সম্পা] (২০০১)। *আরণ্যক একটি দলের নাট্যকথা*, মধ্যমা, ঢাকা।

কবীর চৌধুরী, ১৯৮১। *প্রসঙ্গ নাটক*, 'নাটক ও সমকালীন সমাজ-জীবন', বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

জিয়া হায়দার, ২০০৭। *থিয়েটারের* কথা ৫ম খণ্ড, 'অগাস্টো বোয়াল: নির্যাতিতের থিয়েটার ও সমাজ-বিপ্লব', বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, ২০০৩। *নাট্যতত্ত্ব বিচার*, করুনা প্রকাশনী, কলকাতা।

নাসির উদ্দিন ইউসূফ বাচ্চু, ২০১৬। 'মামুনুর রশীদ আমাদের উৎপল দত্ত' মামুনুর রশীদ সম্পর্কে নাসির উদ্দিন ইউসূফ বাচ্চুর সাক্ষাৎকার, জাগো নিউজ২৪.কম, ২৪ এপ্রিল ২০১৬, বিনোদন পৃষ্ঠা-৭।

মামুনুর রশীদ, ২০১৩। *নাটক সমগ্র*-২-'রাষ্ট্র বনাম', নালন্দা, ঢাকা।